Vol. 5 | No. 1 | 1961

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সিলেটের নাগরী লিপি ও বাংলা সাহিত্য

Volume	5
Issue	1
Year	1961
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ মুর্তাজা আলী
Published online	June 15, 1961
DOI	10.62328/sp.v5i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v5i1.7
Pages	153-277
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সিলেটের নাগরী লিপি ও বাংলা সাহিত্য

সৈয়দ মুর্তাজা আলী

॥ এক ॥

সিলেটের মুসলমানদের মধ্যে এক নাগরী লিপির প্রচলন আছে। এই লিপি দেবনাগরী লিপি থেকে ভিন্ন এবং কেবলমাত্র সিলেট জেলার মুসলমানদের মধ্যে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে Sir George Grierson তাঁহার Linguistic Servey of India (vol V p. 224) তে বলেন ঃ

> Among the low class Muhammedans to the east of this district (Sylhet) the use of Deva nagari alphabet occurs. It is extremely common for Muhammadans to sign their names in this character and the only explanation they offer for its use is that it is so much easier to learn than Bengali. Punthis in Bengali are printed in this character but except for this purpose and for the writings of signatures by otherwise illiterate men the script is hardly used, never at least in formal documents.

এ সম্বন্ধে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার Origin and Development of Bengali Language (vol 1 pp. 234-235) এ বলেন ঃ

> "In Sylhet a kind of modified Devanagari called 'Silet Nagari' has a restricted use among the local Mussalmans and this use of Nagari in distant East Bengal and among Mohamedans too is explained as being the result of the influence of early colonies of proselytising Moslems from Upper India who wrote their Vernaculars (Eastern & Western, Hindi dialects) in Devanagari—Persianised Hindi (or Urdu) being not yet in the field and taught

it to the local converts : a tradition in employing this alphabet was thus established and was continued down to our times. Recently this alphabet has been used in printing."

নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব তাঁহার Social History of Kamrupa (1933 pp. 139-41)-তে বলেন ঃ

Though converted to Muhammadan religion those who resided in Sylhet & its neighbourhood and near Bishnupur (Bankura) retained to a certain extent the distinctive feature of their communty. It is remarkable that the alphabet which they adopt while writing their books on subjects connected with the Muhammadan religion is Nagri though the language used is Bengali. This alphabet is known as Sylhet Nagari and Mussalmani Nagari. Mussalmani kechchas are printed in Calcutta from types adopted from the characters of Sylhet Nagari. Fifty years ago Munshi Abdul Karim, an inhabitant of Sylhet, returning from Europe, constructed the Nagari types after having revised the alphabet on European model by rejecting many of its letters."

নগেন্দ্র বসুর মতে গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণরা শ্রীহট্টে আসার পরে ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিলেও নাগরী লিপির ব্যবহার ছাড়িয়া দেন নাই। এ লিপি সম্বন্ধে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (Indian Historical Quarterly Vol. VI p. 60) বলেন ঃ

There is a Script called Mussalmani Nagri in use amongst the Musalmans of Sylhet. It is on record that many Brahman families of Sylhet embraced Islam. It is in contradistinction to Deva Nagri which Hindus used. It is for the experts to say if the Nagri and Mussalman Nagri derived form a common Script."

এ সম্বন্ধে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে'র লেখক অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি বলেন ঃ

"শ্রীহট্টের মুসলমানদের মধ্যে একরূপ নাগরাক্ষর প্রচলিত আছে। অনেক মুসলমানী কেতাব এই অক্ষরে মুদ্রিত হয়। এই ভাষা অতি সহজে শিক্ষা করা যায় (পৃঃ ৯৭-৯৮)।

Sylhet District Gazetteer (1905)-এ এসম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ

'The Devanagari character is used amongst low caste Muhamadans especialy in the east of the district. They find it easier to master

than Bengali, and Bengali books are printed in this character for that benefit. (p. 74)"

সিলেট নাগরী সম্বন্ধে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ ১৩১৫ বঙ্গাব্দ 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার মতে

"শাহ জালালের সঙ্গে ৩৬০ জন আউলিয়া আইসেন। ইঁহাদের অধিকাংশ উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তখনও বোধহয় আরবী অক্ষরে হিন্দী ভাষা লিখিত হইয়া উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। তাই এই সকল মুসলমান প্রধানতঃ হিন্দী ভাষারই চর্চ্চা করিয়া দেবনাগরাক্ষরে লেখাপড়া করিতেন। তাহাদের অনুকরণে শ্রীহট্টের সাধারণ মোসলমানের মধ্যেও নাগরাক্ষর শব্দ প্রচার হইল। কালক্রমে যদিও পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান সমাজে হিন্দী আরব্য অক্ষরে লিখিত হইয়া আরব্য পারস্য শব্দবহুল হইয়া উর্দুতে পরিণত হইল এবং সেই উর্দু সমগ্র মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়া শ্রীহট্টেও পৌঁছিল, তথাপি এই অঞ্চলের মুসলমানেরা নাগরাক্ষর একেবারে পরিত্যাগ করিলনা। তবে এই নাগরাক্ষরের প্রসার অনেকটা খর্ব্ব হইল। একদিকে স্থানীয় চলভাষা অন্যদিকে মুসলমানদের আলোচ্য আরব্য, পারস্য ও উর্দু ভাষা—এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া নাগরাক্ষর হীনপ্রভ এবং শীর্ণ ও বিকৃত হইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছিল যে, নিম্নস্তরের মুসলমানদের মধ্যে যাহারা বাংলা অক্ষর জানিতনা তাহারা পরস্পরের মধ্যে চিঠি পত্রে মাত্র এই অক্ষরের ব্যবহার করিত।"

এ সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেনের মত (History of Bengali Literature p. 118)

"The Muslim Settlement of Sylhet remained in more or less cultural isolation. They had never lost contact with their west country co-religionist. They cultivated Hindi Poetry and had kept up the use of Kayathi script amongst themselves. In the last quarter of nineteenth century books were printed in this script which was known as Sylhet Nagri. The Muslim poets of Sylhet prefered writing purely romantic narratives as well as Vaisnava lyrics and mystic songs."

সিলেটী নাগরী সম্বন্ধে সুলতান আহমদ ভূঁইয়া 'বিদেশী হরফে প্রাচীন বাংলা' পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তবে "মুসলমান অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট ধর্মশাস্ত্র মূলক সাহিত্য প্রচারের প্রেরণাই নাগরী অক্ষর প্রচলনের মূলে কার্য্য করিয়াছে" তাহার এই উক্তিই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

এই লিপির ব্যবহার প্রধানতঃ সিলেটের মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হিন্দুরা এই লিপির সঙ্গে মোটেই পরিচিত ছিলেন না। সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চলে —সদর, করিমগঞ্জ ও মৌলবীবাজার সবডিভিসনে এই লিপির ব্যবহার বেশী প্রচলিত। ছিল কাছাড় জেলায় ও ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ সবডিভিসনেও একসময়ে সিলেটী নাগরী পুথির প্রচার ছিল। পুরুষদের তুলনায় নারীরা এই লিপি বেশী ব্যবহার করিতেন। অশিক্ষিত মুসলমান—যাহারা বাংলা অক্ষর লিখিতে পারিতনা —শুধু নাগরী লিপিতেই তাহাদের নাম দস্তখত করিতে পারিত। কোন কোন প্রাচীন দলিলে নাগরী লিপিতে নাম দস্তখত দেখা গিয়াছে। রাজকার্যের সঙ্গে এই লিপি প্রচলনের কোন সম্বন্ধ ছিলনা। নাগরী পুস্তকের কতকগুলি নামাজ, রোজা, হজ, ইসলামী চালচলন, ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক। কতকগুলি মারিফতি বিষয়ক। কতকগুলি পুথিতে পীর ও আউলিয়াদের জীবনী লিখিত আছে। এই সকল পুথি অশিক্ষিত লোককে শোকে দুঃখে সান্ত্বনা ও বিশ্রামে আমোদ দিয়াছে। নাগরী পুথি পল্লীর জীবন সরস করিয়া পল্লীবাসীদের সাহিত্য ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অভিজাত বংশীয়দের বাদ দিলে পল্লীবাসীর জনচিত্ত এই লিপিতে লিখিত সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করে। কম পরিশ্রমে ও কম সময়ে শেখা যায় বলিয়া স্ত্রীলোকের মাঝেও ইহার বহুল প্রচার ছিল। সাধারণ্যে প্রবাদ ছিল যে নাগরী লিপি আড়াই দিনেই শিখা যায়। নাগরী লিপি সংযুক্ত বর্ণ ও অনেক জটিল অক্ষর থেকে মুক্ত। এই কারণে সিলেটী নাগরী লিপি অতি সহজেই শিখা যায়।

সিলেটী নাগরীতে মাত্র ৩২টী বর্ণ আছে। তন্মধ্যে উ, এ, ও, ক, খ, গ, চ, জ, ট, ত, থ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, ও ল এই ১৮টী বর্ণের সঙ্গে দেব নাগরী বর্ণের সাদৃশ্য আছে। ছয়টী বর্ণ—ই, ঠ, ড, ঢ, দ ও ড়—বঙ্গলিপি থেকে গ্রহণ করা হইয়াছে। আটটী বর্ণ—আ, ঘ, ঝ, ধ, র, ল, হ সিলেটী নাগরীর নিজস্ব Grierson এর Linguistic Survey of India (Vol V part II p. 10) তে মুদ্রিত কাইথী অক্ষরের সঙ্গে সিলেটী নাগরী অক্ষরের তুলনা করিলে দেখা যায় নাগরীর ফ ও র বর্ণ গুলি কাইথী অক্ষর হইতে আসিয়াছে। সিলেটী নাগরীর ভ বর্ণের সঙ্গে কাইথী লিপি ভ বর্ণের সাদৃশ্য আছে। এ স্থলে সিলেটী নাগরী, বঙ্গলিপি ও দেবনাগরী লিপির নমুনা দেওয়া গেল। সিলেটী নাগরীর বর্ণ মালা উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গৃহীত হইয়াছে। একটী উচ্চারণের জন্য একটী বর্ণ—ধ্বনি

বিজ্ঞানের এই নিয়ম অনুসারে নিম্নলিখিত বর্ণগুলি বর্জন করা হইয়াছে—ঈ, ঐ, ঔ, ঋ, ঌ, ঙ, ঞ, ণ, য, য, স, অ, ম্ম, স্ত, ব, ঃ, ঢ়। সিলেটী নাগরীর বর্ণ নির্বাচনে আরবী ফারসীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আরবী ফারসীর অনুকরণে সিলেটী নাগরীতে অ বর্ণ নাই। আরবীর ওয়াও (و) বর্ণের অনুকরণে সিলেটী নাগরীতে ব বর্ণের নীচে বিন্দু দিয়া ও কে গ্রহণ করা হইয়াছে। সিলেটী নাগরীর ক, খ, ও ফর উচ্চারণ আরবী কাফ (ق), খে (خ), ও ফে (ف) র মত। উহা স্থানীয় উচ্চারণের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়াছে। সিলেটী নাগরীতে (হ্রস্ব ইকার) ি বর্জিত হইয়াছে। ইকার অক্ষরের পূর্বে আসে এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া শুধু (দীর্ঘ ঈকার) ী কার গ্রহণ করা হইয়াছে। এ কার ও ঐ-কার বর্ণের পূর্বে বসে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য একার ও ঐকারকে অক্ষরের মাত্রার উপর যথাক্রমে ৲ ⋎ রূপে দেওয়া হইয়াছে। সিলেটী নাগরীর আলোচনায় আমি অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর প্রবন্ধ হইতে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। শিবপ্রসন্ন বাবু কিন্তু আকার, ঈকার, একার, ঐকার ইত্যাদির রূপ দেখান নাই। তাহার নমুনার ছ, ঝ, ট, ভ ও ল অক্ষর ঠিক সিলেটী নাগরীতে ছাপার অক্ষরের মত নয়।

যদিচ সিলেটি নাগরী যুক্তাক্ষর বর্জিত তথাপি এই লিপিতে ল্ল, ন্দ, স্ত এই তিনটী যুক্ত বর্ণের ব্যবহার দেখা যায়।

অধ্যাপক দানী প্রমান করিতে চান যে সিলেটী নাগরী লিপি আফঘান মুদ্রার নাগরী লিপি হইতে আসিয়াছে। অধ্যাপক লাহিড়ী বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা প্রমান করিছেন যে আফঘান মুদ্রার লিপির সঙ্গে সিলেটী নাগরী লিপির বিশেষ সাদৃশ্য নাই।

সিলেটী নাগরীতে লেখা হাতের লেখা পুঁথি বিশেষ পাওয়া যায় নাই। সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদে মাত্র ৪।৫ খানা হাতের লেখা পুথি আছে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সংগ্রহ, ও অধ্যাপক আলী আহমদের সংগ্রহে এক এক খানা পুথি আছে। আমার কাছেও একখানা হাতের লেখা পুথি আছে। হাতের লেখা পুথির সংখ্যা দ্বারা মনে হয় ছাপার অক্ষরে গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে নাগরী লিপিতে বেশী বই লেখা হয় নাই।

শ্রীহট্ট শহর নিবাসী মৌলভী আবদুল করিম উনবিংশ শতাব্দীর দিকে (১৮৬০-৭০ খৃঃ) ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সিলেটী নাগরী লিপিকে কিছু

বাংলা, দেব নাগরী ও সিলেটি নাগরী লিপির তুলনা

বাংলা	দেব নাগরী	সিলেটী নাগরী	বাংলা	দেব নাগরী	সিলেটী নাগরী	বাংলা	দেব নাগরী	সিলেটী নাগরী
অ	अ, अ	×	চ	च	ꠌ	প	प	ꠙ
আ	आ, आ	ꠀ	ছ	छ	ꠍ	ফ	फ	ꠚ
ই	इ	ꠁ	জ	ज	ꠎ	ব	ब	ꠛ
ঈ	ई	×	ঝ	झ	ꠏ	ভ	भ	ꠜ
উ	उ	ꠃ	ঞ	ञ	×	ম	म	ꠝ
ঊ	ऊ	×	ট	ट	ꠐ	য	य	×
ঋ	ऋ, ऋ	×	ঠ	ठ	ꠑ	র	र	ꠞ
ঌ	ऌ	×	ড	ड	ꠒ	ল	ल	ꠟ
এ	ए	ꠄ	ঢ	ढ	ꠓ	ব	व	×
ঐ	ऐ	×	ণ	ण, ण	×	শ	श	ꠡ
ও	ओ, ओ	ꠅ	ত	त	ꠔ	ষ	ष	×
ঔ	औ, औ	×	থ	थ	ꠕ	স	स	×
ক	क	ꠇ	দ	द	ꠖ	হ	ह	ꠢ
খ	ख	ꠈ	ধ	ध	ꠗ	ড়	ड़	ꠠ
গ	ग	ꠉ	ন	न	ꠘ	ঢ়	ढ़	×
ঘ	घ	ꠊ	×	×	×	ং	ं	ꠋ
ঙ	ङ	×	×	×	×	ঃ	ः	×

* আগাজ পুথি মহব্বত নামা *

✿ ꠁꠃꠍꠥꠚ ꠎꠟꠤꠈꠣ ✿

✿ ꠝꠢꠛ꠆ꠛꠔ ꠘꠣꠝꠣꠞ ꠙꠥꠕꠤ ✿

✿ ꠔꠤꠞꠙꠖꠤ ✿

ꠝꠣꠛꠥꠖ ꠀꠟ꠆ꠟꠣ ꠙꠞꠅꠄꠀꠞ • ꠛꠦꠢꠖ ꠔꠣꠞꠤꠚ ꠔꠣꠞ ঃ
ꠀꠍꠝꠣꠘ ꠎꠝꠤꠘ ꠖꠥꠘꠦ ꠛꠠꠣ ॥
ꠙꠣꠘꠤꠔꠦ ꠎꠝꠤꠘ ꠞꠣꠈꠦ • ꠇꠦꠝꠔꠦ ꠜꠣꠡꠤꠀ ꠕꠣꠇꠦ ঃ
ꠀꠍꠝꠣꠘ ꠕꠥꠁꠘꠦ ꠈꠣꠠꠣ ✿
ꠝꠞꠣ ꠎꠤꠔꠣ ꠈꠣꠘꠣꠙꠤꠘꠣ • ꠇꠦꠐꠣ ꠇꠤ ꠢꠣꠟꠔꠦ ꠞꠘꠣ ঃ
ꠎꠔꠖꠤꠘ ꠎꠤꠘꠖꠦꠉꠤ ꠕꠣꠇꠦ ꠎꠣꠞ ॥
ꠡꠇꠟ ꠢꠥꠇꠥꠝꠦ ꠀꠟ꠆ꠟꠣ • ꠞꠥꠢꠥ ꠝꠣꠢꠚꠦ ꠟꠦꠈꠤꠟ ꠁꠟ꠆ꠟꠣ ঃ
ꠞꠔꠤ ꠝꠣꠡꠣ ꠘꠢꠦ ꠎꠦ ꠘꠠꠤꠛꠣꠞ ✿
ꠇꠦꠅꠞ ꠝꠘꠖ ꠇꠞꠤꠛꠣꠞ • ꠔꠣꠝꠣꠝ ꠖꠥꠘꠤꠀ ꠝꠤꠟꠦ ঃ
ꠇꠤꠛꠣ ꠇꠤꠍꠥ ꠜꠣꠟꠣ ꠇꠞꠤꠛꠣꠞ ॥

[বাংলা অনুলিপি]

ইউছুফ জলিখা

মহব্বত নামার পুথী

তিরপদি

মাবুদ আল্লা পরওয়ার বেহদ তারীফ তার
আছমান জমিন দুনে বড়া।

পানীতে জমিন রাখে কেমতে ভাসিয়া থাকে
আছমান থুইনে খাড়া।

মরা জিতা খানাপিনা কেটা কি হালতে রনা
জতদিন জিনদেগী থাকে যার।

সকল হুকুমে আল্লা রুহু মাহফে যে লেখিল ইল্লা
রতি মাসা নহে যে নড়িবার।

কেওর মনদ করিবার তামাম দুনিয়া মিলে
কিবা কিছু ভালা করিবার।

সংশোধন করিয়া উহার ছাপা খানা স্থাপন করেন। এই ছাপা খানা 'ইসলামিয়া প্রেস' নামে পরিচিত। বহুকাল আবদুল গনি ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এখনও এই প্রেস হইতে সিলেটী নাগরীতে কিছু কিছু বই ছাপা হয়। সিলেট শহরের সারদা প্রেস হইতে ও নাগরী হরফে বই ছাপা হইত। দেশবিভাগের আগে ১৬ নং গার্ডেনার লেন তালতলার বেনীমাধব ভট্টাচার্য্যের জেনারেল প্রিন্টিং প্রেস থেকে নাগরী বই ছাপা হইত। এই প্রেস পরে ১৪১ নং আপার সার্কুলার রোডে উঠিয়া যায় ও চুনীলাল ভট্টাচার্য ইহার মালিক হন। শিয়ালদহের হামিদী প্রেস হইতেও কিছু নাগরী বই ছাপা হয়। নাগরী পুস্তকের প্রকাশকদের মধ্যে ইসলামিয়া প্রেসের সত্বাধিকারী মুনশী আবদুল গনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। হাজী আবদুর রহমান, মুনশী আমিনউদ্দীন আহমদ, আবদুল ওয়াহেদ ও মোহাম্মদ আবুল হোসেনও নাগরী পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

সিলেটী নাগরী কুল নাগরী নামেও পরিচিত। কেহ কেহ মনে করেন সিলেটে নবাগত মুসলমানদের মধ্যে যাহাদের মাতৃভাষা কাইথী লিপিতে লেখা হইত তাদের দ্বারাই সিলেটে এই লিপির প্রচলন হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আফগানরা সিলেট জিলায় বিশেষ প্রতাপশালী ছিলেন। ঐ সময়ের খোয়াজ ওসমান, বায়জীদ, আনোয়ার খান, পাহলওয়ান ইত্যাদি আফগান সর্দারদের কথা 'বাহারিস্তানে ঘাইবী'তে পাওয়া যায়। মোগলদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া তাহারা সিলেটের দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ভানুগাছ, প্রতাপগড়, বানিয়াচুঙ্গ, তরফ ইত্যাদি স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রভুত্ব করিতেছিলেন; অধ্যাপক সুলতান আহমদ ভূইয়ার মতে ইহারা স্থানীয় কথ্য ভাষা বাংলা শিখিয়া ফেলেন; বাংলা হরফের জটিলতা দেখিয়া তাহারা কাইথী লিপিতে বাংলা লিখিতে সুরু করেন। দুরূহ ও স্বল্প ব্যবহৃত ও জটিল বাংলা অক্ষরগুলি বাদ দিয়া তাহারা সিলেটী নাগরী লিপির সৃষ্টি করেন। স্থানীয় নবদীক্ষিত মুসলমানরা যখন দেখিলেন যে এই লিপি সরলতর ও যুক্তাক্ষর বর্জিত ও অতি সহজেই লিখিতে পারা যায় তখন তাহারা সিলেটী নাগরী অক্ষর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধ্বনি বিজ্ঞানের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় সিলেটী নাগরী বাংলা লিপি হইতে অনেক উন্নত। এই উন্নত আধুনিক ধ্বনি বিজ্ঞান সঙ্গত লিপি পাঠান আমলে সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। সিলেটী নাগরীতে লেখা সাহিত্য অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। এই সাহিত্যের বিষয়

বস্তুর দিকে লক্ষ্য করিলে ধারণা হয় উহার বিষয়বস্তু দোভাষী পুথির সমসাময়িক। এমনকি হজরত শাহজালালের জীবনী সম্বন্ধীয় সিলেটী নাগরী পুথিও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৬০ খৃঃ) লিখিত 'সোহেলী ইমন' গ্রন্থের অনুবাদ। যদি সিলেটী নাগরীতে প্রাচীন কালে পুথি লেখা হইত তবে নিশ্চয়ই অন্ততঃ শাহজালালের অলৌকিক জীবনী সম্বন্ধে কোন পুথির সন্ধান মিলিত। সিলেটী নাগরীতে লেখা হাতের লেখা পুথির সংখ্যাল্পতাও ইহার অর্বাচীনতার সাক্ষ্য দেয়।

শ্রীহট্ট কাছাড়ে প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি জগন্নাথ দেব ইত্যাদি সাহিত্যিক প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব হইতে সংগ্রহ করিতেছেন। ঐ সকল সংগ্রহে একখানি সিলেটী নাগরী পুথি নাই। যদিচ হিন্দু সাহিত্যিকরা মুসলমান গ্রন্থকার রচিত পুথি সংগ্রহে বিশেষ মনোযোগী হন নাই তথাপি ঐ লিপিতে সুপ্রাচীন হস্তলিখিত পুথি পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই তাহা অবহেলিত হইত না। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে মুসলমান লেখকদের লেখা অনেক ফারসী ও উর্দু পুথির উল্লেখ আছে কিন্তু নাগরী লিপিতে লেখা কোন পুথির উল্লেখ নাই।

এই সকল কারণে আমাদের মনে হয় পলাশীর যুদ্ধের পরে যখন দেশ হইতে ফারসী ও উর্দু ভাষার চর্চ্চা উঠিয়া গেল তখন সাধারণ মুসলমানরা বাংলা সাহিত্যের দিকে নজর দিল। তাহারা দেখিতে পাইল বাংলা লিপি—বিশেষত সংযুক্ত বর্ণ—অত্যন্ত জটিল। আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের প্রভাবে বাংলা গদ্য তখন জাত বদল করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের ভাষাকে তখন যাবনী মিশাল বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। একেত সিলেটের কথ্য ভাষা নদীয়া শান্তিপুরের সাধুভাষা থেকে অনেক পৃথক, তদুপরি সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ নিমিত্ত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের সাধুভাষা মুসলমানদের একেবারে দুর্বোধ্য মনে হইল। কাজেই বাধ্য হইয়া তাহারা নিজস্ব লিপি ও সাহিত্য সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইলেন। যে সকল মুসলমান এই লিপির সৃষ্টি করেন তাহারা দেবনাগরী ও কাইথী লিপি জানিতেন। কাজেই তাহারা বাংলা, দেবনাগরী ও কাইথী লিপি হইতে এই নূতন লিপি সৃষ্টি করিলেন। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে এই লিপিতে আ, খ, ছ, ঝ, ধ, র, ল ও হ-এই কয়টী নূতন অক্ষর যাহা সৃজন করা হইল তাহাদের আকৃতি বাংলা কিম্বা দেবনাগরী লিপি হইতে সরলতর।

কাজেই আমাদের ধারণা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ—অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সিলেটী নাগরী লিপির সৃষ্টি হইয়াছে।

॥ দুই ॥

অতঃপর নাগরী লিপিতে প্রচারিত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। এই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে সাদেক আলী, শীতালং শাহ, দৈখুরা মুনশী, ইরফান আলী, শাহনূর, শাহ হুসন আলম, প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

(১) সাদেক আলী—তিনি ১৮০১ খৃঃ লংলা পরগনার দৌলতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পূর্ব নাম ছিল গৌর কিশোর সেন। তাহার পিতার নাম রাম গোবিন্দ সেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রথম হিঙ্গাজিয়াতে মুন্সেফ ছিলেন ও ৭ বৎসর এই চাকুরী করেন। (মৌলবীবাজার সবডিভিসন খোলার পূর্বে হিঙ্গাজিয়াতে মুন্সেফী কাছারী ছিল)। তিনি তাহার লেখা রদ্দে কুফুর পুথিতে লিখিয়াছেনঃ "মানুষ মরিলে তাহার প্রাণ কোথায় যায়?" এই প্রশ্ন হৃদয়ে উদিত হইলে তিনি ধর্মালোচনায় মনোনিবেশ করেন। অবশেষে তিনি ঢাকায় গিয়া তথাকার কামেল দরবেশ শাহ সুফি নকি উল্লা সাহেবের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন ও তাহার মুর্শীদের আদেশে ধর্ম প্রচারে মনোযোগী হন। তিনি ইটা পরগনার লামু গ্রামের হাজির ঠাকুর নামক এক সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকের মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঐ গ্রামে স্থায়ীভাবে বসত করেন। তাহার বংশধরগণ ঐ গ্রামে বাস করিতেছেন। তাহার লেখাপুথি হালাতুন্নবী, রদ্দে কুফুর মহব্বত নামা ও হাসর মিছিল। হালাতুন্নবী নাগরী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় পুস্তক। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা ও হজরত মোহাম্মদের (দঃ) এর জীবনী আছে। উহা পয়ার ত্রিপদী ২৮১ পৃষ্ঠার পুস্তক। 'মহব্বত নামা'—ইউসুফ জোলেখার প্রেম কাহিনী। 'হাসর মিছিল'—ইহাতে উপমাসহ হাসরের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। 'রদ্দেকুফুর' গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মের সমালোচনা ও ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের আত্মজীবনী ও তৎকালে মুসলমান সমাজের অবস্থাও ইহাতে বর্ণিত আছে।

(২) ইরফান আলী ১৮৪১ খৃঃ এ করিমগঞ্জ মহকুমার কসবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা মৌলবী বিরাত আলী আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষা ভালরূপে জানিতেন। বাল্যকালে তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় পড়েন। ইহার পরে তিনি ফকিরের বেশে কয়েক বৎসর দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান। গানের প্রতি তাহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তাহার সুললিত কণ্ঠের বাউল গান যে শুনিত সেই

মুগ্ধ হইত। মুন্‌শী সাহেব সুপুরুষ ছিলেন। তিনি ২।৩ বৎসর জীবিকার সন্ধানে কলিকাতায় ছিলেন। তৎপরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিবাহ করেন। তিনি নিজে এক মৌলবী সাহেবের কাছে ভালরূপে আরবী ফারসী শিখেন। কিছুকাল তিনি নিকটস্থ বাঘন গ্রামের মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। মুন্‌সী সাহেব কোমল হৃদয়, সমাজহিতৈষী ও মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সাধ্যমত পাড়া প্রতিবেশীকে সাহায্য করিতেন। তাহারই চেষ্টায় কসবা ইমামবাড়ী মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯২৬ খৃঃএ মুনসী সাহেবের ওফাৎ হয়। তাহার লিখিত পুস্তকের মধ্যে 'মুফিতুল মুমিনীন' সবিশেষ প্রচলিত ও সমাদৃত হইয়াছিল। উহাতে নামাজ, রোজা ও মারিফতী বিষয়ক নানা রাগ ও বাউলগান স্থান পাইয়াছে। রংপুরের আতাউল্লা লেখেন মফিতুল মুমেনীন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। ইরফান আলীর 'আখবারুল' ইমান, 'ছয়ফুল বেদাত' ও 'রাহাত নামা' ধর্ম্ম ও মারিকতি সম্বন্ধ। রাহাত নামা বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাংলা অক্ষরে তাহার নিম্নলিখিত পুথি মুদ্রিত হইয়াছে 'জঙ্গে রোম', 'শাহজালালের তোয়ারিখ,' 'আপাইনামা' 'জলের (বন্যার) কবিতা,' 'জারমানী পালা', মৌলবী মোহাম্মদ আলী'। নিম্নে তাহার দুইটি গানের নমুনা দেওয়া গেল।

ভবের পেরমে কলংকিনী সার
যে পড়ে পীরিতের ফান্দে আশা নাই তার বাচিবার। ধুয়া
আগে আগে সোয়াগে সোয়াগে গলায় দিনু পীরিতের হার
তোরা দেখ আসি লাগছে ফাসি শক্তি নাই মোর ছাড়িবার।
ঈমান আমান যায়, জাতিকুল যৌবন যায় আর
যার লাগি কলংকি হইলু, সে বুঝি নয় আমার।
কুসঙ্গীদের সঙ্গ লইয়া, ভবের হাট মোর গেল লইয়া গো
কারে দুষ দিমু আমার মনা হইল দুরাচার।
অধীন ইরফানে বুলে ভয়ের জালে হইছি গিরিফতার
আখেরে ভরসা রাখি নবীজীর চরণ ধুলার

ফান্দে = ফাদে, সোয়াগে = সোহাগে, গইয়া = গোয়াইয়া, মনা = মন

দেখ মন পড়িল বাকী জায়
সনের খিরাজ বাকী রইল উলল নাই তৌজি চিঠায়। (ধুয়া)
জুতিয়া খাইলাম জমিবাড়ী জমার কি উপায়

এই যে দিন পাওনা ছিল তোমার লাটের তারিখ গাইয়া যায়।
জমিদারের জমিদারী রাখা বিষম দায়
জমা উশুল না হইলে তালুক নিলাম ডাকায়।
জমির জমা সনে সনে আদায় করা চায়
আর দখল রাখিতে হয়, ছাড়িলে না পাওয়া যায়।
অধীন ইরফানে কয় মোর কি হইবে উপায়
জমিতে দখল নাই মোর জমা না হইল আদায়।

জুতিয়া=বন্দোবস্ত নিয়া   লাটের তারিখ=রাজস্ব আদায়ের শেষ দিন

প্রথম গানে কবি মোহাচ্ছন্ন মানব হৃদয়ের আকুলি অতি সুন্দর রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দ্বিতীয় গানে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক কি - রূপকের ভিতর দিয়া কবি তাহা অতি সুন্দর রূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) শাহনুর। হবিগঞ্জ মহকুমার জালালশাফ গ্রামে শাহনুরের জন্ম হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। তাহার পিতার নাম সৈয়দ নুর, মাতার নাম কলসী বিবি। শাহনুরের মুরশীদ ছিলেন শাহা মনজুর আলী ও পীর ছিলেন শাহা চান্দ মিয়া। শফীউল্লার পুত্র মছু নামক মুরীদকে শাহনুর পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর পরে সে চলিয়া যাওয়ায় শাহনুর অত্যন্ত ব্যথিত হন। শাহনুর মৌলবীবাজার শহরের নিকটবর্ত্তী কদম হাটায় বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। জালাল হাফে তাহার কবর আছে। তাহার বংশধরেরা তথায় বাস করিতেছেন।

শাহনুরের কাছে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ ছিলনা। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের বাড়ী যাইতেন ও উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে পীরের মত ভক্তি করিত। একটী প্রচলিত গানে তাই আছে।

কদম হাটা বিনে ছিরি
তাতে শাহানুরে বানাইলা বাড়ী,
শাহনুর থাকেন চাড়াল পাড়ার মাঝে।

বানাইলা=তৈরী করিলেন   চাড়াল=চণ্ডাল

শাহানুর স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি যে সকল গীত ও সারিগান রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি শ্রীহট্ট জেলার বহুল প্রচারিত। তিনি উঁচুদরের দরবেশ ছিলেন। খোদার ঈশকে মশগুল হইয়া তিনি যে সকল গান রচনা করেন তার নাম 'নুর নছিয়ত'। মারফত সম্বন্ধে এই পুথি ছাপাইতে কবি নিষেধ করেন।

কাজেই এই পুথি ছাপা হয় নাই। শাহানুর ভাবাবেগে বিভোর হইয়া গান গাহিতেন। শিষ্যগণ তাহা অমূল্য সম্পদ মনে করিয়া আয়ত্ত করিত। শরীরের মধ্যে মন আছে এই বর্ণনা দিতে কবি গাহিয়াছেনঃ—

কাজল কোঠা ঘরের মাঝে বৈছন কোন জন
লীল দরিয়ার মাঝে বসি খেলে অনুক্ষণ।

শাহানুর মানিকের সন্ধানে সাগরে নামিয়াছেন। কিন্তু মানিক পাইয়া তিনি হারাইয়া ফেলিলেন।

দরিয়ায় পড়িলাম আমি মানিক পাইবার আসে
পাইয়া হারিলাম মানিক আপন করম দোষে।

তুলনীয়

নগর বসালেম, সাগর সেচিলাম, মানিক পাবার আসে
সাগর শুকাল, মানিক লুকাল, অভাগী করম দোষে।

চণ্ডীদাস

শাহানুর গাহিয়াছেন

'দরিয়ার পারে পারে ডাকি বারে বার,
খেওয়ানীয়ে না করে পার, মুই যে গোনাগার ;
নাও নাই, বৈঠা নাই, জানি না সাঁতার।'

তুলনীয়

আতর সাঞ্চিত নাই কঞ্চিত সাতারে।
মানসে মনন যেতে পয়োনিধি পারে।

সদ্ভাব শতক

শাহানুর গাহিয়াছেন

'বন্ধু প্রেমের পিয়াসীরে (ধুয়া)
বন্ধু তোর সনে পীরিতি করি,
ঘরে না মুই রইতে পারি।
বন্ধুরে দিবানিশি ঝুরিয়া মরি তুই বন্ধুর লাগিয়া
রাইতে দিনে চাহিয়া থাকি পন্থ নিরখিয়া।
বন্ধুরে সহিতে না পারি দুখ সদায় জলে হিয়া,
স্বপনে দেখি বন্ধু না পাইনু জাগিয়া।

বন্ধুরে সৈয়দ শাহানুর কয় উদাসিনি হইয়া
কি দোষে পরাণের বন্ধু না চাও ফিরিয়া।

বন্ধু ফিরিয়া না চাহিলেও প্রেমিকের ভালবাসা হ্রাস পায় না, শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। শেষে প্রেমিক আত্মবিস্মৃত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে—তার প্রেমানুরাগ আরও বৃদ্ধি পায়।

সৈয়দ শাহনুরের অন্য গ্রন্থ সাতকন্যার বাখান মুদ্রিত হইয়াছে। এই পুথিতে কবি হস্তিনী, শঙ্খিনী, নাগিনী, কাঞ্চুনী, কিঞ্চুনী, চিত্তনী, পদ্মিনী ইত্যাদি সাত রকম নারী চরিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তকের দ্বিতীয়াংশে গৃহজামাতার বিড়ম্বনার একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়।

(৪) মুনির উদ্দিন আর একজন জনপ্রিয় লেখক। তাহার বাসস্থান মৌলভী বাজার সবডিভিশনের নোয়াখালী গ্রামে ছিল। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দৈ খাইতে ভালবাসিতেন বলিয়া সাধারণ্যে দৈখুরা মুনশী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মারিফতী সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন ও নিত্য নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিতেন। তাহার স্বর অতীব মিষ্ট ছিল, যে শুনিত সেই মুগ্ধ হইত। বাহাদুর পুরে তাহার কবর আছে। তাহার গানের সংগ্রহ 'দইখুরার রাগ' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার একটী গান উদ্ধৃত করা গেল—

আমি মিছা কলঙ্কিনী সংসারে
সখীরে, পরাণ বন্ধে ছাড়িয়া গেল আমারে।
বৃন্দাবনে মধুপুরে হয় গো রসের খেলা।
তাহে হয় মনে জ্বালা হায় হায় হায়।
ওগো শুকনা কমল শুকাইয়া গেল,
পায় না মধু ভমরায়।
মধুপুর গেলা হরি না আসিলা আর
হইল গোকুল অন্ধকার হায় হায় হায়।
ওগো করনে সুখচারিনী ঘুরে ভ্রমর নি বলে।
দৈখুরা পাগলে কয় আল্লার নাম সার
মিছা ভবের বাজার হায় হায় হায়।
কি জবাব দিবা মনা কবর হাসরে।

(৫) নাগরী লিপিতে রচিত সাহিত্যের এক প্রসিদ্ধ লেখক শীতালাং শাহ। তাঁহার আসল নাম মাং সলিম। তিনি ১২০৭ সালে করিমগঞ্জ সবডিভিসনের শ্রীগৌরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মুনশী সলিম একজন আলেম ও স্বভাব কবি ছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাব্য প্রতিভার বিকাশ লাভ ঘটে। মারিফত তত্ত্বে কামিলতী লাভের পর তিনি শীতালাং শাহ এই বিনয় সূচক নাম গ্রহণ করেন। শীতালাং শব্দের অর্থ পায়ের গোড়ালি। তিনি নামাজ রোজা ইত্যাদি এবাদত ও মারিফতি তত্ত্ব সম্পর্কে বহু শত গান রচনা করেন। কিছুদিন পূর্বে 'শীতালাঙ্গী রাগ' নামে তাঁহার গানের সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। কবির বংশধরগণ জীবিত আছেন। নিম্নে তাঁহার গানের নমুনা দেওয়া গেল—

প্রথম পিরাতের মজা, দ্বিতীয় পিরীতে সাজা
তৃতীয় পিরীতে রাজা, রংখুশী বেশুমার।
শীতালাং ফকিরে বলে, প্রেমমালা যার গলে
(ওগো) কেউ কারো কথা নাহি শুনে, কেবল বন্ধুয়া বন্ধুয়া সার।

(৬) মুনশী বুরহান উল্লা ওরফে চেরাগ আলী। তিনি সিলেট শহরের উপকণ্ঠে আখালিয়া নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে 'হালতুন্নুর' নামক একখানা বৃহৎ পুথি লেখেন। সিলেট শহরের কাজিটুলা নিবাসী শরাফত উল্লা ও করিম বকস ১৮৯৬ খৃঃএ এই পুথি প্রকাশ করেন। রচক নিজ পরিচয়ে বলিয়াছেন—

পরিচয় বলি আমার শুনহে ইসলাম,
পিতা এ রাখিয়া ছিলা বুরহান উল্লা নাম।
মুর্শিদে রাখিলা নাম অধম চেরাগ আলী।
আলীম উল্লা মরহুম মেরা পিতার নাম
পারকুলের এলাকায় আখলিয়া ঘর।
মুছাফিরখানা মেরা জান বেরাদর।"

'হালতুন্নুর' হজরতের জীবনী। ইহাতে আল্লার নুরের বর্ণনা ও মারফতী কথা ও গান আছে। তিনি আরও দুইখানা গ্রন্থ 'ইবরত নামা' ও 'রাগনামা' লেখেন। এই দুই গ্রন্থ সম্ভবত ছাপা হয় নাই।

(৭) মৌলবী আবদুল ওহাব। তিনি বরায়া পরগনার ফুলবাড়ী গ্রামে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দরবেশ ও আলেম ছিলেন। তাঁহার

'হাসর তরান' গ্রন্থ কাজীটুলা হাফেজ আমিন উদ্দিন আহমদ প্রকাশ করেন। তাহার আর একখানা বই ছিল 'ভব তরান'। 'পুথি পরিচিতি'তেঃ (পৃঃ ৬৭৯) এই বই দুইটির উল্লেখ আছে।

(৮) শাহ আছদ আলী—বিগত শতাব্দীতে তিনি সুনামগঞ্জ সহরের ষোলঘর মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭৮ খৃঃএ সামাজিক চরিত্র ও বিভিন্ন রকমের লোক চরিত্র বর্ণনামূলক 'শহর চরিত' রচনা করেন। হাফেজ আমিন উদ্দীন আহমদ ইহার প্রকাশক ছিলেন।

(৯) আমান উল্লা—শ্রীহট্ট সদরের অধিবাসী। ১৮৮৬ খৃঃ তিনি জীবিত ছিলেন। তাহার লেখা পুথি 'মফিতুল ইসলাম'—এই পুথিতে মুসলমান সমাজের পালনীয় ধর্মীয় আচার ও ইহার গুণ মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার রচিত অন্য পুথি 'ইবরত নামা' ও 'রাগনামা'। ইবরত নামাতে ধর্মতত্ত্ব মূলক কতকগুলি অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা দ্বারা লোককে সৎপথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। 'রাগনামা' আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক গানের পুস্তক। ফাজিল নাসির মোহাম্মদ (১৭২৭), সাগর আলী, মোহাম্মদ পরান, চম্পাগাজী ইত্যাদিও 'রাগনামা' লিখিয়াছেন। কিন্তু উহাদের বিষয়বস্তু রাগতাল শিক্ষা দান। ঐ সকল পুথি সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ক।

(১০) ওয়াজিদ উল্লা—গহরপুর পরগণার, লামাপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি লেখেন 'হুসিয়ারে গাফেলীন'—ইহাতে ধর্মতত্ত্ববিষয়ক কয়েকটী পয়ার ও গান আছে। তাহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মাহে রমজান'—রমজান মাসের ফজিলত বর্ণনা ও কয়েকটী মারফতি গান।

(১১) শাহ হরমুজ আলী—সিলেট সদর সবডিভিশনের বাসিন্দা। তিনি গভীর তত্ত্বজ্ঞানী সাধক কবি ছিলেন। তিনি 'দিল নছিহত' পুথিতে মারিফতের অনেক গোপন তত্ত্বের, খোদার বন্দেগীর নিয়ম কানুন ইত্যাদি সমাবেশ করিয়াছেন। কয়েকটী মারফতী গীতও আছে। 'হরমুজ নছিত'ও একই বিষয়ক। আবদুস সামাদ 'নসিহত নামা' (১৮৭০) লেখেন। আবদুল হাকিমও নসিহত নামা (১৮৭০খৃঃ) লেখেন। আবদুল্লা ও সোলেমান বা সলিমের নসিহত নামার বিষয়বস্তু ভিন্ন রকমের। হরমুজ আলীর তৃতীয় পুস্তক 'মিছলে দুনিয়া' লোক চরিত্র মূলক। ইহাতে জগতের বিভিন্ন তত্ত্ববিষয়ক নানা কথার সমাবেশ আছে।

(১২) শাহ সৈয়দ আবদুল কাদের—'আহকামে স্বরার' লেখক। দৈনন্দিন নামাজ, রোজা, ইত্যাদি ধর্মীয় ব্যবস্থা পালন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই পুস্তকে আছে। ইসলাম ধর্মের অন্যান্য বিধি প্রণালীও ইহাতে বিবৃত আছে। গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। মালেক মোহাম্মদ লেখেন 'আহকামল জুমা' ১৮৫৬ খৃঃএ।

(১৩) আবকুস আলী—তিনি ঘিত্তা পরগণার ধরাধর পুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন সাধক ফকির ছিলেন ও তাহার হাজার হাজার মুরীদ ছিল। গহরপুর পরগণার রতনপুরের শাহ কাছিনা উম্বা তাহার 'হকিকতে সিতারা' প্রকাশ করেন। ইহা একখানি মারিফতি গীতের পুথি। তাহার অন্য বই 'কবি নামা'।

(১৪) শাহ মাং আবদুল্লা—ইনি কোথাকার অধিবাসী ছিলেন জানা যায়না তাহার লেখা বই 'হজনামা' হজযাত্রীদের জ্ঞাতব্য বই। সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহে খণ্ডিত পুথি (৪৮৮ নং) ছিল। ভাষার নমুনা থেকে মনে হয় লেখক বোধ হয় শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন না।

(১৫) আবদুল করিম—ইনি জিন্তা পরগনার হারাতৈল গ্রাম নিবাসী। ইনি 'ওজু নামাজের কবিতা' লেখেন। ভট্ট কবিতার ছন্দে তিনি নানা ধর্মীয় বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের পিতার নাম মুন্সী মাং জকি। ইহার অন্য গ্রন্থ 'ওয়াজিবুল আমল'। ইহাতে আখের, বেহেশত, দুজখের বর্ণনা সহ নামাজ রোজা ইত্যাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বোধহয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন।

(১৬) মাং জওয়াদ লেখকের পরিচয় পাওয়া যায় না। ফারসী 'বাহার দানেশ' নামক গ্রন্থ হইতে রাজপুত্র বাহরাম ও মন্ত্রীকন্যা জহুরার প্রেম কাহিনী অবলম্বনে এই পুথি লেখা হইয়াছে।

আজম দেশের বাদশা জাদা বাহরাম ও উজীর জাদী জহুরা পরস্পরের প্রেমে পতিত হন। ক্রমে একথা বাদশাহ ও উজীরের কানে পৌছিলে তাঁহারা নানাবিধ যন্ত্রণা পাইতে থাকেন। অবশেষে দুইজনে গোপনে পলায়ন করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পথিমধ্যে উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটে। পরে বহু বিপদ অতিক্রম করিয়া উভয়ে মিলিত হন। বিচ্ছেদের পর জহুরার খেদ—

কান্দেন জহুরা বিবি এলাহি আলমিন ভাবি
ঘোড়া হইতে জমিনে নামিয়া।

দুনু আংখে আছু জারি বুকেতে পাথর মারি
দম ঢালে বাহরাম বলিয়া।
কহে কি করিমু হায় এখন হইল দায়
জান মেরা না হয় করার
কি করিলে আল্লাতালা নেকি বদি বুরা ভালা
সব করা তেরা এখতিয়ার।
আমি অধমের তরে বাচাইবে পরওয়ারে
তেরা নাম গফুরুর রহিম।
পেগামবর খলিলেরে আতস হইতে বাচাইলে
সবইতি তেরা এখতিয়ার।
পেগামবর ইউছুপেরে ভাই সবে কুয়ায় ফেলে
তারে তুমি করিলে আছান।
পেগামবর রছুলেরে মেহরাজে যবে নিলে
সাথী দিলে ছিদ্দিক আকবর
কলিম মুছার তরে আশাতে মুহর দিলে
তুমি আল্লা করিম রহিম।
আমি নাপাকের তরে কৃপা কর নৈরাকারে
তবে মোর বাঁচেত হুরমত।

১৮৩৭ খৃঃএ এনায়েতউল্বা 'বাহার দানেশ' অনুবাদ করেন। পরে দ্বারকা নাথ রায়ও 'বাহার দানেশ' অনুবাদ করেন। এনায়েত উল্বার পুথির নাম 'বাহরাম জহুরা'

(১৭) মাং খলিল—লেখক সম্ভবত সিলেটের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'চন্দ্রমুখী' নামে একটি প্রেমোপাখ্যান লেখেন। মিছির নগরের কুমার গুলসুনাহর শিকারে গিয়া গন্ধর্বকন্যা চন্দ্রমুখীর প্রেমে পড়েন। তিনি গোপনে চন্দ্রমুখীর সঙ্গে মিলিত হন। ইতিমধ্যে তাহার পিতার প্রেরিত লোকেরা আসিয়া তাহাকে বাহির করে। তিনি তখন চন্দ্রমুখীর প্রাসাদ হইতে পলায়ন করেন। চন্দ্রমুখী তাহাকে অনুসরণ করেন ও পরে মিলিত হন। এস্থলে চন্দ্রমুখীর অভিসারিকার বেশ ধারণের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি—

সুন্দর বদনে কইন্যা সাজাএ সিংগার
গলাএ তুলিয়া দিল গজমোতি হার।

ঝাড়িয়া মাথার কেশ করিলা সুবেশ
নবলাখের জাদে কইন্যা বান্ধে মাথার কেশ।
আগুনিআ পাটের শাড়ী করিল পরিধান
সর্ব অঙ্গে ছিটাইল অগুরু চন্দন।
নবগুঞ্জের মালা যেন দেখিতে সুন্দর
মুখেতে আরশি জ্বলে নাকেতে বেশর।
নয়ানে কাজল পরে শিরেতে সিন্দুর
দুই পত্র শোভে তান বাজন নেপুর।

খলিলের কাব্য-প্রতিভার পরিচিতির জন্য নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দেওয়া গেল ঃ

মরণ নিকটে রাখি কাদে চন্দ্রমুখী
দারুণ কাটারি বালা সম্মুখেতে রাখি।
নিঠুর তোর বাপ মাও কঠিন তোর হিয়া
আমারে ছাড়িয়া আইলা ফুলের বেশ দিয়া।
সঙ্গে আইনু, পরিচয় দিলু বারেবার।
না চিনিলায় দুষ্টমতি কি দোষ আমার।
যদি বা থাকিত মনে চন্দ্রমুখা কার
তে কেনে করিত বিয়া ইন্দ্রের আবেশ্বরী।
এ বুলিয়া আল্লানবী করিয়া স্মরণ
কাটারি হৃদেতে হানি তেজিল জীবন।
আবেশ্বরী=অপসরী

(১৮) মুন্সী জাফর আলী—ঢাকা দক্ষিণ পরগণার বাদেপাশা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি হজরতের অছিয়ত সম্বন্ধে 'আছিয়তুন্নবী' পুথি লেখেন।

(১৯) সৈয়দ আকবর আলী ওরফে ছাবাল শাহ—তিনি গুধবাইল পরগণার মোহাম্মদপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আবদুল আজিম। তাহাদের পূর্ব পুরুষ তরফ পরগনাতে বাস করিতেন। তিনি 'এস্কে দেওয়ানা' বা 'প্রেমের পাগল' নামক মারিফতী গীতের পুথি লিখেন।

(২০) ভেলা শাহ—তিনি রফিনগর পরগনার অধিবাসী। তিনি কিশোর বয়সে পশ্চিমে চলিয়া যান ও সেখানে এক কামিল দরবেশের মুরীদ হন। দরবেশ মৃত্যুর পূর্বে তাহার ঐশী শক্তি নাকি শিষ্যকে দান করেন। ভোলা শাহ তখন

দেশে ফিরিয়া আসেন। অনেকে তাঁহার মুরীদ হন। তাঁহার মুরীদ পিয়ার শাহ। পিয়ার শাহের মুরীদ নাইওর শাহ ও তাঁহার মুরীদ ছিলেন লাল শাহ। ভেলা শাহ 'খবর নিশান' নামক মারিফতি সম্বন্ধে বিস্তৃত পুথি রচনা করেন।

(২১) হাজী মাং ইয়াসিন—তিনি জালালপুর পরগনার পূর্বগ্রাম নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম মোহম্মদ মোহসিন। তিনি স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর পরগনার ইয়াকুব নগর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ১৮৩৬ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন ও ১৯২১ খৃঃ এ মারা যান। তিনি 'প্রেমার্শি', 'মায়াবলী' 'তালিবে জন্নাত' ও 'মাজেজাতুন্নবী' নামক চারিখানা গ্রন্থ ছাপান। 'রমনীদর্পণ' ও 'রুহুল মারিফত' নামক দুইখানা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছেন। 'প্রেমার্শি' আল্লার প্রেমবিষয়ক মারিফতী সঙ্গীত পুস্তক। 'মাজেজাতুন্নবী' পয়গাম্বর মোহাম্মদের জীবনী ও জীবনের অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে বৃহৎ পুথি। মায়াবলী পুথিতে গ্রন্থকার মায়ার বন্ধকই যে পারলৌকিক অন্তরায় ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'তালেব জান্নাত' পুথিতে গানের সাহায্যে তিনি বেহেশতের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। 'রমনী দর্পণ' নারীর চরিত্র গঠন ও ধর্মাচরণ মূলক পুস্তক।

নিম্নে হাজী ইয়াসিনের গীতের নমুনা দেওয়া গেল।

নিরঞ্জন ত্রিভুবন, পলকে কৈল স্বজন
তাহার মহিমা অগনন।
আকাশ বায়ুতে ঘোরে, পৃথিবী বায়ুর ভরে
দিবানিশি রবি শশী, করিছে ভ্রমণ॥ (তাহার মহিমা)
ছয় ঋতু ছয় মতে, বিরাজিছে এ জগতে;
ঋতু ভেদে হইতেছে বৃক্ষাদি স্বজন। (তাহার মহিমা)
ডিম, বাচ্চা, বীজ হতে কুদরতি কুদরতে;
তিন আকারে হইতেছে বৃক্ষ, লতা, জীবগণ॥ (তাহার মহিমা)
বার বুরুজ বার স্থানে, রাখিয়াছে নিরঞ্জনে;
গগণমণ্ডল গুণে রবি, শশীতে গ্রহণ॥ (তাহার মহিমা)
যত জীব এ জগতে কেহ নহে এক মতে
কেহ কালো, কেহ সাদা, কেহ শাওলা বরণ॥ (তাহার মহিমা)
ইয়াছিন বলে মন, প্রভু গুণ অলেখা;
যত কিছু খাদ্য দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদন॥ (তাহার মহিমা)

(২২) জহুরুল হোসেন—তরফ পরগণার মধুপুর গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ শাহ ইজাবত আলী। তিনি একজন বিখ্যাত পীর ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম ও মারিফত সম্বন্ধে গান রচনা করেন। তাঁহার রচিত পুথির নাম 'নুরনাজাত' 'জওয়াহের' ও 'মারিফত জওয়াহের'। 'জওয়াহের' অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে।

(২৩) ওয়াহেদ আলী—তিনি সুনামগঞ্জের লক্ষণ শ্রী পরগণার ষোলঘর মৌজার নিবাসী ছিলেন। তিনি কারবালা সম্বন্ধে 'জঙ্গনামা' নামে ৫০০ পৃষ্ঠার একখানা পুথি লেখেন। তাহার ভাষার নমুনা দেওয়া গেলঃ

ইমাম হোসেন যুদ্ধ সজ্জা

এত বলি শাহাজাদা দু'রেকতি নমাজ
পড়িয়া করিল আপে মহিমের সাজ।
জেরাবখত লিয়ে পিন্দে আলি মর্তুজার
রছুলের দেওয়া পাগ ছিরের দস্তার।
মবারক জুল্‌ফ যুই পড়িয়াছে কান্দে
কোমর বান্দিলা যে দাউদের কমরবন্দে।
ছালে পয়গম্বরের মোজা পরিলেন পায়
হজ মক্কার কোবা জোড়া তুলি দিলা গায়।
পৃষ্ঠেতে বান্দিলা ঢাল আমীর হামজার
হস্তে তুলি লইলা তেগ আলি মর্তুজার।
তীর তরকশ ছুলফা খনজর কামান
নেজা গুর্জ ছংগ পাশী আরবি নিশান।
সাজান করিলা ঘোড়া দুলদুল সংকার
অতিশয় উচা ঘোড়া পর্বত আকার।

জঙ্গনামার অন্যান্য লেখক হইতেছেন হায়াত মামুদ (১৭২৩) মোহাম্মদ খান (১৬৪৬), চট্টগ্রামের সিরুল্লা (১৮শ শতাব্দী) ইত্যাদি। মোহাম্মদ খান বাংলা ভাষায় জঙ্গনামার এক জন প্রসিদ্ধ লেখক। তাহার পুথির নাম 'মুক্তাল হোসেন'। চট্টগ্রামের মনসুরের জঙ্গনামার নাম 'আমীর জঙ্গনানা'। পশ্চিম বঙ্গের গরীবুল্লা জঙ্গনামার একজন বিখ্যাত লেখক। রাধাচরণ গোপ নামক এক হিন্দু কবিও জঙ্গনামা লেখেন। তাঁহার বইয়ের নাম 'ইমামের জঙ্গ'। উহা ১৮২৭ খৃঃ এ

লেখা হয়। বাংলা ভাষায় জঙ্গনামা কাব্যের আদি লেখক দৌলতউজীর বহরম খান। আবদুল হাকিম সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখেন কারবালা। উনিশ শতকে সাদ আলী ও আবদুল ওহাব 'সহীদে কারবালা' নামে বড় আকারে যে কাব্য প্রণয়ন করেন সেটাই সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। সাধু ভাষায় এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অবশ্য বিষাদসিন্ধু। সৈয়দ মোহম্মদ হায়াত সপ্তদশ শতাব্দীতে 'জারী জঙ্গনামা' লেখেন। উহা কালিম মির্জার উর্দু 'জঙ্গনামার' ভাবানুবাদ।

সিলেটী নাগরীতে একখানা 'জারী জঙ্গনামা' আছে। তবে লেখকের নাম জানা যায় না। কেহ কেহ এয়াকুবকে জঙ্গনামার আর একজন লেখক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মতে এয়াকুব লিপিকার মাত্র। অধ্যাপক জামান গরীবুল্লার কাব্য সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা করিয়াছেন। তাহার মতের সঙ্গে ডাঃ সুকুমার সেনের মতও মিলে। কাজেই এয়াকুবকে জঙ্গনামার লিপিকর মনে করাই সমীচীন মনে হয়। জঙ্গনামার অন্যান্য লেখক হইতেছেন মোহাম্মদ আলী, জনাব আলী ও সফিউদ্দীন।

(২৪) আবদুল করিম—তিনি সিলেট শহরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি নাগরী সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য বহু যত্ন ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নাগরী অক্ষরের টাইপ তৈয়ার করেন। তিনি উদ্যোগ ও চেষ্টা করিয়া নাগরী অক্ষরের ছাপাখানা সৃষ্টি না করিলে নাগরী লিপির প্রচার হয়ত হাতের লেখা পুথিতেই সীমাবদ্ধ থাকিত। তাহার রচিত 'কড়িনামা' বহু মূল্যবান সমাজচিত্র মূলক পুথি। ইহাতে কড়ি অর্থাৎ অর্থশালী লোকের মতিগতি ও ধনহীন লোকের দুর্দশার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অন্য পুথি 'ছদছী মছলা'—১৩০ ফরজের বিবরণ ও 'সোনাভানের পুথি'। ইহার বিষয়বস্তু হজরত আলীর পুত্র মোহাম্মদ হানিফার ত্রয়োদশতম যুদ্ধের কাহিনী। সোনাভান টুঙ্গি শহরের নারী বাদশা ছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হানিফা তাঁহাকে বিবাহ করেন।

সোনাভান পুথি হইতে কবির রচনার নমুনা—

সোনাভান ও হানিফের বচসা

বরুন রাজার কন্যা সম্বন্ধে বহিনী
হেকমতে ধরিলে তারে আমি খুব জানি।

হানিফা কহেন বিবি ভালত কহিলি
তাহার সম্বন্ধে তুমি হইলে মোর শালী।
শালী হয়ে এত তুমি কর লানতান
শুনিলে বহিনী তেরা হবে অপমান।
সোনাভান বলে আইলে আলি পাহালওান
তবু না পারিবে আমার কাটিতে গরদান।
হানিফা বলেন তুমি ভারি বেহিছাব
শশুরের নাম ধর শুনিতে খারাব।

লানতান = লানত দেওয়া।

বাংলা ভাষায় সোনাভানের অন্যান্য লেখক গরীবুল্লা ও ফকির মোহম্মদ।

আবদুল করিমের আর একখানা পুথি 'ওয়াজিবুল আমল'—প্রয়োজনীয় অভ্যাস। এই পুথিতে মুসলমানদের কর্তব্য ধর্মীয় কাজের বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ঐ পুথি পাঠে ফরজ ও ওয়াজিব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হইত ও অশিক্ষিত লোক এই পুথির সাহায্যে ধর্মকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারিত। নিম্নে 'কড়িনামা' হইতে কবির রচনা শক্তির উদাহরণ দেওয়া গেল—

আখেরী জমানা হল কড়িতে সকলি গেল
কড়ি হইল কুলপতি সার।
কড়ি বুঝে করি মান, কড়িয়ে হুরমত জান।
কড়ি হইলে রণের ছিপাই।
কড়িয়ে সকলি করে বেটা দিয়া বাপ মারে
ভাই দিয়া ভাইরে লড়ায়।
কড়ি হইলে ভালা নারী, কড়িয়ে বহাব জারী
কড়ি হইলে ইজ্জত বেসুমার।
যে জনের হয় কড়ি সবে ডাকে মিয়া বুলি
নাম তার খনকার বাহাদুর।
যাহার সভাতে যায় বিছানা ছাড়ে তার দায়
ছালামের শুরু ঠাট গোল।
হাজি হাজি কহে সবে জুনাব আসিলা কবে
আমরা সবার আজব নছিব।
হেলানদার চৌকী আন, মিয়া বড় পেরেসান
পাংখা লইয়া করহ তদবীর।

ঘিউ চিনি খাটা মিঠা শীঘ্র আনরে বেটা
ধরি রাখ মিয়ার হুজুরে
আলমে খাইবা পিছে আগে আন মিয়ার কাছে
মিয়ার নিহাত জরুর।

হুরমত = সম্মান, খাটা = টক, আলম = জনসাধারণ, হাজী = সম্মানিত ব্যক্তি।

অর্থশালী ব্যক্তিকে তোষামোদ করা ও গরীবকে তুচ্ছ করার কথা লেখক সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাত ধুলাইতে পানি খানছা লইয়া টানাটানি
কে পাইবে সোহাগীর মান
মিয়ার সম্মুখে রাখি আর চিজ কত বাকী
দৌড়ে ধাপে চলে আগুয়ান।
জোড় হাত করি বসে খাড়া হইয়া বলে তবে
মনে কিছু না করিও ছাহেব
অধম গরীব জানি খান কিছু নিমক পানি
আর কি হইবে ভাগ্য মোর।
মিয়া যদি মিছা কয় সবে বলে হয় হয়
অমাবস্যাতে দেখিয়াছি চান্দ
মিয়ার বেটীর সাদি সবে বুলে পরিজাদী
যার রূপ হুরের সমান
আজি দিনে কড়ি যার বহুত বড়াই তার
পায়ের নাম জুনাব শরীফ
সে যদি মারিয়া যায় লোকে বলে উফাত পায়
মরে বন্দা কড়ি নাই গরীব।

ধলাইতে = ধুয়াইতে, চিজ = বস্তু, খাড়া = দণ্ডায়মান, হয় হয় = নিশ্চয়ই সত্য।

(২৫) সৈয়দুর রহমান—লেখক সিলেট শহরের অধীবাসী। তাহার লেখা পুথি 'দেশ চরিত' লোক চরিত্র মূলক পুস্তক। মুসলমান সমাজে অনাচার ও ধর্ম নৈতিক দুর্বলতার আলোচনা ও প্রতিকারের উপায় নির্দেশিত হইয়াছে।

(২৬) ছমিরুদ্দীন – কারী ছমিরউদ্দীন লাউড় পরগনার রাজাপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার লিখা পুথি 'ইবরতুল ইনছান'—সামাজিক চিত্র মূলক। তিনি

সমাজকে সৎপথ দেখাবার উদ্দেশ্যে অসিদ্ধ বিবাহ, গাজাখোর ফকির, আলপেট (আলবার্ট—পুরুষের লম্বা চুল রাখা) ইত্যাদি ভাটের কবিতাও লিখিয়াছেন। সিলেট শহর নিবাসী আবদুল লতিফ বহিখানি সংশোধন করেন।

(২৭) মজহারুল হক—লেখক করিমগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'তরিকুন্নবী' লেখেন। ইহা হজরত মোহাম্মদের অচার ব্যবহার বিষয়ক পুস্তক। ইহাতে মুসলমান সমাজের শিক্ষণীয় নানা বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(২৮) আবদুর রহমান—লেখক সিলেট শহরের মীরের ময়দান মহল্লার নিবাসী ছিলেন। তিনি 'তোওয়ারিখে জালালী'র অনুকরণে হজরত শাহজালালের জীবনী বিষয়ক 'হজরত শাহজলালের পুথি' লেখেন। 'তওয়ারিখে জালালী' হজরত শাহ জলাল সম্বন্ধে সুপরিচিত ফারসী পুস্তক 'সোহেলে ইমন'এর বঙ্গানুবাদ। তিনি ১৯২৯ ইংরেজী সালের বন্যার বর্ণনা করিয়া 'বন্যার কবিতা' ও 'জালালী কবিতা'ও লিখিয়াছেন।

(২৯) মিয়াজান আলী—ইনি লংলা পরগনার মৌলিকপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি লংলা পরগনার বিখ্যাত আলিম মওলানা ইনামউদ্দীন সাহেবের জীবনী বিষয়ক 'মৌলানা ইনামউদ্দীন সাহেবের তারিখ' লেখেন।

(৩০) আবদুর রহমান—ইনিও লংলা পরগণার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তক 'হুরমতুল সিনা' ইহাতে গান বাজনা ইত্যাদি সরিয়ত বিরোধী বলিয়া প্রমাণিত করা হইয়াছে। প্রকাশক উক্ত পরগণার বাগ্রিহাল নিবাসী রহমতউল্লা।

(৩১) ফজলউদ্দীন আহমদ—কুবাজপুরের তেখরিয়া পল্লী নিবাসী ছিলেন। তিনি 'ওলীগণের কবিতা' লেখেন। উহা হজরত শাহ জালালের সঙ্গী দরবেশ কুতুবউদ্দিন আউলিয়ার (যাহার মাজার ইটা পরগণার সাগরদিঘীর পারে অবস্থিত) জীবনী।

(৩২) কারী আবদুল ওয়াহেদ—তাহার নিবাস ঢাকাদক্ষিণের দক্ষিণ ভাগে ছিল। তিনি 'তওক্কুলিয়া প্রেমভাণ্ডার' নামে একখানা গীতের পুথি লেখেন।

(৩৩) হিফজুর রহমান—তাহার বাড়ী করিমগঞ্জ সবডিভিশনের জফর গড়ে ছিল। ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি 'তালিমুল ইসলাম' পুথি লেখেন।

(৩৪) মোবারক আলি—তাহার বাড়ী জৈন্তায় ছিল। তিনি ১৯২৯ খৃঃ এর বন্যা সম্বন্ধে 'জলের কবিতা' লেখেন।

(৩৫) সরাফত উল্লা—তাহার বাড়ী রেঙ্গা পরগণার ফারঙ্গ পাশা গ্রামে ছিল। তিনি শ্রীহট্টের সুপরিচিত জমিদার আলী আমজাদ খার জীবনী বিষয়ে 'আলী আমজাদ সাহেবের কবিতা' ও 'দুই সতীনের কবিতা' লেখেন।

(৩৬) মাং আবদুল মজিদ—তাঁহার বাড়ী ভানুগঞ্জ পরগণার বলরাম পুর গ্রামে ছিল। তাঁহার পিতার নাম কোরবান আলী। ইঁহাদের পৈতৃক ব্যবসা পীর মুরিদি। ইনি একজন তেজস্বী আলেম ও বক্তা ছিলেন। তিনি মারিফৎ, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে 'অশিকনামা' ও 'বয়ানুল ইমান' লেখেন।

(৩৭) ইউসুফ আলী—তাহার বাড়ী ভানুগাছ পরগণার বলরামপুর ছিল। তিনি মারিফতি বিষয়ে 'মাওতনামা' নামে একখানা পুথি লেখেন।

(৩৮) হরমুজ উল্লা—তাহার বাড়ী দিনাজপুর পরগণার ফুলপুর গ্রামে ছিল। তিনি মারিফত বিষয়ে 'দিলখোস নামা' লেখেন। ইহাতে অনেকগুলি গীত ও ১৩০ ফরজের বিবরণ আছে। প্রকাশক পৌদনাপুর নিবাসী মোং রিয়াছত। মেটিয়াবুরুজ নিবাসী আবদুল জব্বার ১৮৯৬ খৃঃ এ 'কেচ্ছা দেলখোশ' লেখেন।

(৩৯) শাহ মোহম্মদ ইয়াসিন—তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার কৈলা শহরের লক্ষীপুর মৌজার অধিবাসী ছিলেন। তাহার পূর্ব পুরুষেরা তরফে বাস করিতেন। ইনি একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি মারিফতী বিষয়ে বহুসংখ্যক গীত রচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১০০টী গান লইয়া 'আশিকে খোদা ও হুব্বে রসুল' নামক পুথি ছাপান হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহার অনেক অমুদ্রিত গান আছে।

(৪০) শাহ হুসন আলম—এই কবি সম্বন্ধে অধ্যাপক নিজামউদ্দীন আহমদ প্রথম বর্ষের বাংলা একাডমী পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কবির বাসস্থান সুনামগঞ্জ সবডিভিশনের পীরের গাওয়ে ছিল। ঐ গ্রামে এ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও সৈয়দ তাহির আলম ও তাহার পুত্র তৈয়ব আলম পীর মুরিদি করিতেন। খুব সম্ভব হুসন আলম তাঁহাদের উর্দ্ধ পুরুষ ছিলেন। আমি সুনামগঞ্জে

অবস্থানকালে হুসন আলম সম্বন্ধে আলোচনা ও কবির বাসস্থান সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহ করি। তাঁহার একমাত্র গ্রন্থ 'ভেদসার'। ইহার বিষয়বস্তু মারিফতি। কবি সুফীবাদের সাধনা করিয়াছেন। তরিকতের ভিতর দিয়া হকিকতে পেঁছা কবির উদ্দেশ্য। সংসারের অনিত্যত্য সম্বন্ধে হুসন আলম বলেন:

'তিরি পুতর ধন জন সব একাকার
মওত কালে কেহ নাই সঙ্গে যাবে আর।
না রহিব দয়া মায়া সব নিব হরি
কার বাপ কার ভাই কার পুতুর তিরী।
তিরী—স্ত্রী, পুত—পুত্র, মওত—মৃত্যু

কলিকালের কপটতা সম্বন্ধে কবি বলেন:

দেখ এই কলির ভক্ত মন অগীয়ান
রিদএ কপট মুখে বুলে মুসলমান
কলিমা কালাম জানে অনেক প্রকারে
মুখে বলে ধরম সার কপট হিদয়ে।
অগীয়ান—অজ্ঞান রিদএ, হিদয়ে—হৃদয়ে।

আল্লাহ-তালা তার সৃষ্টির মাঝে গুপ্ত আছেন এইভাব কবি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

দুদত নবনী যেন আছে মিশিয়া
তেমতে রহিছে প্রভু ভুবন জুড়িয়া।
দুদত—দুধের মধ্যে নবনী—ননী

অধ্যাপক নিজামউদ্দীনের মতে কবির "গানগুলি কোথাও বর্ণণাত্মক আবার কোথাও আত্মকেন্দ্রিক গীতিধর্মী। কবি নিজে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়াছেন ও কাঁদাইয়াছেন। সঙ্গীতের হৃদয়গ্রাহী সুরঝঙ্কার নীরস দার্শনিক ও অধ্যাত্মিক কাব্যবস্তুর উপর সুরধুনীর তরলতা ও সুরমাধুর্য সৃষ্টি করিয়া মধ্যযুগে অনেক কবিই কাব্য রচনা করিয়াছেন কিন্তু নিজের মন ও জীবন সম্বন্ধে আশা নিরাশার তরঙ্গাভিঘাতে দিশাহারা হইয়া এমন অসহায় আর্ত ক্রন্দন কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কবির বাণী তাহার হৃদয়ের মর্মস্থান ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে। তাহার ভক্তি ও প্রেম এক অবিমিশ্র কারুণ্যে সত্যই বড় মধুর।"

অধ্যাপক নিজামউদ্দীন সাহেব কবির সময় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সিলেটী নাগরীর লেখক কিন্তু অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বের কোন কবির সন্ধান এখনো আমরা পাই নাই। কবির ভাষা আধুনিক বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত কবি বড়জোর ১৭৫০-১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। কবির বংশাবলী সংগ্রহ করিলে তাঁহার সঠিক কাল নির্ণয় সম্ভব হইবে।

(৪১) সেখ ভানু তাঁহার বাড়ী হবিগঞ্জের বামৈ পরগনায় ছিল। তাঁহার পিতার নাম মুনশী নসরুদ্দীন। তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। তিনি জীবনের ৪০ বৎসর পর্যন্ত ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তৎপর তাঁহার মনে বৈরাগ্যের ভাব উদিত হয়। তখন তিনি বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মিলন শাহ নামক কামিল ফকিরের মুরীদ হন। তিনি বিগত শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। মুনশী আশরফ হোসেন সেখ ভানুর ৪০টী গান সংগ্রহ করিয়াছেন। সেখ ভানুর সুপ্রচলিত গান ঃ

নিশীথে যাইও ফুল বনেরে ভমরা
    নিশীথে যাইও ফুল বনে।
নয় দরজা করিয়া বন্ধ   লইও ফুলের গন্ধ
    অন্তরে জপিও বন্ধের নাম।
জ্বালাইও দিলের বাতি   ফুটব ফুল নানা জাতি হে
    কত রঙ্গে ধরব ফুলের কলি।
ডালপাতা বৃক্ষ নাই   এমন ফুল ফুটাইছে সাই হে
    ভাবুক ছাড়া বুঝবে না পণ্ডিতে।
অধীন শেখ ভানু বলে   ঢেউ খেলাইও আপন দিলে হে
    পদ্ম যেন ভাসবে গঙ্গার জলে।

বন্ধ = বন্ধু

যাইতে হবে পিঞ্জিরা ছাড়িয়া প্রাণ শুয়ারে,
    যাইতে হবে পিঞ্জিরা ছাড়িয়া। ধুয়া
না করিলে হিসাবের কাম,   না লইলে মৌলাজীর নাম
    ভুলিয়া রইলে খাইয়া দুধ কলা।
আজরাইল আসিলেরে   পিঞ্জিরাত ভাঙ্গিবার
    কোথায় লুকাইবায় সেই বেলা
কার লাগি কলঙ্কের ডালি   লইলাম মাথায় তুলি

শুনতাম তোর চান্দ মুখের বুলি।
আমারে ফাকি দিয়ারে যাইবায় তো ছাড়িয়ারে
পিঞ্জিরা পড়িয়া রইব খালি।
স্ত্রী পুত্র মাতা পিতা এ সব মমতায় গাথা
ভাইবে দেখ কেউ কার নয়।
হুকুমে আসিলা যবে, তলবে যাইতায়বে
মিছারে তোর কৈরে পরিচয়।
অধীন শেখ ভানু বলে, শুয়া পাখী উড়িয়া গেলে
পিঞ্জিরা পড়িয়া রইব খালি।
ফুলের মধু ফুলেরে যবে না থাকিবরে
বসিয়া উড়িয়া যাইব অলি।

পিঞ্জিরা—পিজরা শুয়া—পক্ষী বিশেষ তলবে—হুকুম মতে,

(৪২) রাগ হরিবংশ। ভবানন্দের হরিবংশ একখানা উচুদরের কাব্য। সতীশচন্দ্র রায় এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া সার্থকভাবে সম্পাদনা করিয়াছেন। ভবানন্দ শ্রীহট্টের অধিবাসী। সতীশ বাবু যে সমস্ত পুথি হইতে হরিবংশ সম্পাদন করেন তন্মধ্যে দুইখানা পুথি শ্রীহট্ট জেলায় পাওয়া যায়। হরিবংশের ভাষা, বাক্য গঠন প্রণালী ইত্যাদি হইতে প্রতীয়মান হয় লেখক শ্রীহট্টের লোক ছিলেন। পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ অনুমান করেন যে ভবানন্দ লাউড়ের লোক ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

রাগ হরিবংশে হরিবংশের গানগুলি সংকলিত হইয়াছে। অবশ্য রাগ হরিবংশের গান ও সতীশ বাবুর সম্পাদিত হরিবংশের গানগুলি সব এক নহে। মনে হয় হরিবংশের গানগুলি শ্রীহট্টে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। মুসলমান জনসাধারণের সুবিধার নিমিত্ত উহা নাগরী ভাষায় মুদ্রিত করা হইয়াছে।

(৪৩) জৈন্তা পরগণার চুপীরঘাট আগফৌদ মৌজা নিবাসী মোহাম্মদ আবদুল আজিদ 'রাগ বাউলা দিল দেওয়ানা' নামে গানের পুথি রচনা করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া (৪৪) জৈন্তা ছোট দেশের আবদুল করিম 'মফিতুল আওয়াম' (৪৫) জৈন্তা চতুলের আবদুল করিম 'ওয়াজিবুল আমল' (৪৬) আবদুল লতিফ 'বসন্ত ভ্রমরা' নামে পুথি লিখেন। এই সকল পুথি ছাড়া 'আহওয়ালে জমানা' 'জহুরুল আফেলিন', 'হরিণ নামা', 'খাছিয়ত চরিত', 'হুসিয়ার নামা', 'সফাতুন্নবী', 'আবুসামা', 'দেলারাম', 'সিরাজুল মছাইল', 'কেরামতে হাছন হুছাইন'. 'মুরনাজাত', 'প্যাচার গল্প',

ইত্যাদি কয়েকখানি নাগরী পুথি আছে। এই সকল পুথির লেখকের নাম জানা যায় না। প্রকাশকরা নিজেদের স্বার্থ সাধনার্থে গ্রন্থকারদের নাম গোপন করিয়াছেন। আহওয়ালে জমানার বিষয় বস্তু সমকালীন লোক-চরিত্র। 'জহুরুল আফে-লিনে'র বিষয়বস্তু প্রয়োজনীয় ধর্মীয় আচরণ। 'খাছিয়ত চরিত্র'—ধর্ম ও চরিত্র বিষয়ক, 'হুসিয়ার নামা' ধর্মীয় বিষয়ে সাবধান বাণী. 'শফাতুন্নবী' পরহেজগারদের আখেরে নাজাত পাওয়া বিষয়ে, 'আবুসামা'—হজরত ওমারের পুত্র আবুসামার জীবনী ও বিচার সম্বন্ধীয়, দেলারাম—গল্প পুস্তক ও 'প্যাচার গল্প'—উপদেশপূর্ণ কেচ্ছা, 'হরিণ নামা'র বিষয় বস্তু হজরতের সময়ে একটী হরিণীর জীবন রক্ষার কাহিনী। 'হরিণ নামা' অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ।

নাগরী লিপিতে রচিত সাহিত্যের বিবরণ প্রধানত মুন্সী আশরফ হোসেনের বিভিন্ন প্রবন্ধের সাহায্যে লিখিত হইয়াছে।

তথ্য সংকেত

১ বিদেশী হরফে প্রাচীন বাংলা—সুলতান আহমদ ভুইয়া ১৯৫৫

২ শ্রীহট্ট নাগরী লিপির উৎপত্তি ও বিকাশ—ডক্টর আহমদ হাসান দানী
বাংলা একাডেমী পত্রিকা. প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

৩ সিলেটী নাগরী লিপির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—শিব প্রসন্ন লাহিড়ী
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা

৪ পুথি সাহিত্যে সিলেটের মুসলমান সওগাত. ১৩৫৬

৫ সিলেটের ইতিহাস—আলইসলাহ ১৩৬৪-৬৬

৬ শ্রীহট্টের নাগরী সাহিত্য—শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪৩
৪-৬ প্রবন্ধের লেখক মুন্সী আশরফ হোসেন।

৭ পল্লীকবি মুন্সী ইরফান আলী—মোহম্মদ আবদুল বারী
শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৪৩

৮ সিলেট নাগরী—পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৫

৯ Linguistic Survey of India—Grierson, 1903

১০ Origin and Development of Bengali Language,
Suniti Kumar Chatterjee

১১ History of Bengali Literature, Sukumer Sen

১২ ইসলামী বাংলা সাহিত্য ”

১৩ Social History of Kamrupa, Nagendra Nath Basu